এক পয়সার বাঁশী

জসীম উদ্দীন

সূচিপত্র

আসমানী 2
খোসমানী......4
গল্পবুড়ো 6
পূর্ণিমা 8
মা ও খোকন 12

আসমানী

আসমানীরে দেখতে যদি তোমরা সবে চাও,
রহিমন্দীর ছোট্ট বাড়ি রসুলপুরে যাও।
বাড়ি তো নয় পাখির বাসা-ভেন্না পাতার ছানি,
একটুখানি বৃষ্টি হলেই গড়িয়ে পড়ে পানি।
একটুখানি হওয়া দিলেই ঘর নড়বড় করে,
তারি তলে আসমানীরা থাকে বছর ভরে।

পেটটি ভরে পায় না খেতে, বুকের ক'খান হাড়,
সাক্ষী দেছে অনাহারে কদিন গেছে তার।
মিষ্টি তাহার মুখটি হতে হাসির প্রদীপ-রাশি
থাপড়েতে নিবিয়ে গেছে দারুণ অভাব আসি।
পরণে তার শতেক তালির শতেক ছেঁড়া বাস,
সোনালী তার গার বরণের করছে উপহাস।
ভোমর-কালো চোখ দুটিতে নাই কৌতুক-হাসি,
সেখান দিয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু রাশি রাশি।
বাঁশীর মত সুরটি গলায় ক্ষয় হল তাই কেঁদে,
হয়নি সুযোগ লয় যে সে-সুর গানের সুরে বেঁধে।

আসমানীদের বাড়ির ধারে পদ্ম-পুকুর ভরে

ব্যাঙের ছানা শ্যাওলা-পানা কিল-বিল-বিল করে।
ম্যালেরিয়ার মশক সেথা বিষ গুলিছে জলে,
সেই জলেতে রান্না খাওয়া আসমানীদের চলে।
পেটটি তাহার দুলছে পিলেয়, নিতুই যে জ্বর তার,
বৈদ্য ডেকে ওষুধ করে পয়সা নাহি আর।
খোসমানী আর আসমানী যে রয় দুইটি দেশে,
কও তো যাদু, কারে নেবে অধিক ভালবেসে?

খোসমানী

তেপান্তরের মাঠেরে ভাই, রোদ ঝিম-ঝিম করে
রে ভাই, রোদ ঝিম-ঝিম করে ;
দুলছে সদাই ধুলার দোলায় ঘূর্ণি হাওয়ার ভরে।
মাঝখানে তার বট-বিরিক্ষি ঠান্ডা পাতার বায়ে,
বাতাসেরে শীতল করে ছড়ায় মাটির গায়ে।
সেথায় আছে খোসমানী সে সোনার বরণ গা,
বিজলী-বরণ হাত দুখানি আলতা-পরা পা।
সন্ধ্যাবেলা যখন এসে দাঁড়ায় প্রদীপ করে,
হাজার তারা ফুঠে ওঠে নীল আকাশের পরে।
পাকা তেলাকুচের ফলে রাঙাতে ঠোঁট দুটি,
সন্ধ্যা-সকাল রাঙা হয়ে হাসে কুটিকুটি।
রামধনু, তার শাড়ীর পাড়ে দোল খাইবে বলে,
সাতটি রঙের সাতটি হাসি ছড়ায় মেঘের দলে।
সাদা সাদা বকের ছানা নরম পাখা মেলে,
বলে, কন্যা, তোমার শাড়ীর পাড়ে ফিরব খেলে।
মেঘের গায়ে বিজলী মেখে বলে, কন্যা, আয়।
তোরে আজি জড়িয়ে নেব নীলাম্বরীর ছায়।
সে যখনে হাসে তখন হাসে যে ফুলগুলি,
গান গাহিলে বেড়ে তারে নাচে যে বুলবুলি।

সকাল হলে দুর্বাশীষের নীহার-জলে নেয়ে,
আকাশ দিয়ে নেচে বেড়ায় ফুলের রেণু খেয়ে।
এই খুকীটির সঙ্গে তোমার আলাপ যদি থাকে,
ব'লো যেন আসমানীরে বারেক কাছে ডাকে।

গল্পবুড়ো

গল্পবুড়ো, তোমার যদি পেটটি ভরে
রূপকথা সব গিজ গিজ গিজ করে,
আর যদি না চলতে পার, শোলক এবং
হাসির, ছড়ার, পড়ার কথার ভরে;
যদি তোমার ইলি মিলি কিলি কথা
খালি খালি ছড়িয়ে যেতে চায় সে পথের ধারে,
তবে তুমি এখানটিতে দাঁড়িয়ে গিয়ে
ডাক দিও ভাই- ডাক দিও ভাই! মোদের পূর্নিমারে।

যদি তোমার মিষ্টি মুখের মিষ্টি কথা
আদর হয়ে ছড়িয়ে যেতে চায় যে পথের কোণে,
কথা যদি চুমোর মত-ফুলের মত,
রঙিন হয়ে চায় হাসিতে ফোটে ফুলের সনে;
যতি তোমার রাঙা কথা রামধনুকের রঙের মত,
ছড়িয়ে পড়ে কালো মেঘের গায়ে,
যদি তোমার হলদে কথা
হলদে পাখির পাখার পরে সোয়ার হয়ে,
ছড়িয়ে পড়ে সরষে ফুলের হলদে হাওয়ার বায়ে;
যদি তোমার সবুজ কথা শস্যক্ষেতের দিগন্তরে,

ছড়িয়ে যেতে চায় যে বারে বারে;
তবে তুমি এখানটিতে দাঁড়িয়ে গিয়ে,
ডাক দিও ভাই! ডাক দিও ভাই! মোদের পূর্ণিমারে!
গল্পবুড়ো! আবার যদি গাজীর গানের দলটি নিয়ে,
নাচের নূপুর জড়িয়ে পায়ে, গাজীর আশা ঘুরিয়ে বায়ে,
খঞ্জনীতে সুরটি দিয়ে, রূপকথারি আসর গড় সুদূর কোন গাঁয়ে;
চন্দ্রভান রাজার মেয়ে আবার যদি নেমে আসে,
ঘুমলি চোখের পাতার পরে তোমার গানের বায়ে;
আবার যদি মদন কুমার সপ্ত-ডিঙা সাজিয়ে নিয়ে,
দেয় গো পাড়ি কালাপানি-পূবান পানি পেরিয়ে গিয়ে,
ক্ষীর-সাগরের অপর পারে মধুমালার দেশেঃ-
দুধে ধবল আলতা বরণ রাজার কনে ঘুমায় হেসে হেসে,
পাঁচ মানিকের পঞ্চ প্রদীপ পাহারা দেয়
হাতের পায়ের আর শিয়রের দেশে-
আবার যদি গাঁয়ের যত ছেলের মেয়ের,
বোনের ভায়ের মায়ের ঝিয়ের সবার বুকের
সে রূপকথার সে রূপ-সাগর
আনতে টেনে পরাণ তোমার কান্দে বারে বারে;
তবে তুমি ডাক দিও ভাই! ডাক দিও ভাই!
ডাক দিও ভাই! মোদের পূর্নিমারে!

পূর্ণিমা

পূর্ণিমাদের আবাস ছিল টেপাখোলার গাঁয়,
একধারে তার পদ্মনদী কলকলিয়ে যায়।
তিনধারেতে উধাও হাওয়া দুলতো মাঠের কোলে,
তৃণফুলের গন্ধে কভু পড়তো ঢলে ঢলে।
সেখান দিয়ে পুর্ণিমারা ফিরতো খেলে নিতি,
বাঁকাপথে বাজতো তাদের মুখর পায়ের গীতি।
পদ্মানদীর মাঝিরে কেউ ডাকত ছড়ার সুরে,
শিশুমুখের কাকলিতে গ্রামটি যেত ভরে।

সেদিন হঠাৎ পত্র এলো বাবার থেকে তার,
পূর্ণিমারা কলকাত্তা আসবে শনিবার।
গীতা কানু সবাই খুশী, ফিসফিসিয়ে কয়,
ট্রামের গাড়ী, মোটর গাড়ী কলিকাতাময়।
গড়গড়িয়ে গড়ের মাঠে যখন তখন যাব,
ইলেকট্রিকের কল টিপিলে যা চাব তা পাব।
হাওড়া পুলের উপর দিয়ে আসব হাওয়া খেয়ে,
গঙ্গানদী করব উথল মস্ত জাহাজ বেয়ে।

এসব কথায় সবাই খুশী, তবু যাবার দিন

ঘনিয়ে যত আসছে, কোথায় বাজছে ব্যথার বীণ।
বাবলা বনের যেখানটিতে হত পুতুল বিয়ে,
পূর্ণিমা যে ঘুরে বেড়ায় সেইখানটি দিয়ে।

শিকের উপর দুলছে আজো খেলার হাঁড়িগুলি,
দাঁড়কাকটি বসে আছে সেথায় ঠোকর তুলি।
চড়ুইভাতির চুলোগুলি তেমনি আছে পড়ে,
এখানটিতে খেলবে না আর আগের মতন করে।
পোষা বিড়াল কেন যে তার সঙ্গ নাহি ছাড়ে,
যদিও বুকে পিষছে তারে স্নেহের অত্যাচারে।
* * *
* * *
পূর্ণিমারা এসেছে আজ শহর কলিকাতা,
অনেক খোঁজাখুঁজির পরে পেলেম তাদের পাতা।
শ্যামবাজারের বামধারেতে অন্ধগলির কোণে,
একতলা এক বন্ধ ঘরে থাকে অনেক জনে।
জানলা দিয়ে বয় না বাতাস, সারাটি ঘর ভরে,
ভ্যাঁপসামত গন্ধে সদাই দম আটকে ধরে।
ভাই-বোনেতে কদিন আগে জলবসন্ত হতে
ভাল হয়ে উঠেছে আজ এই তো কোনো মতে।
চোখ দুটি তার কোটরাগত, ফুলের মত মুখে

হাসির প্রদীপ জ্বলে না আর শিশুকালের সুখে।

কোথায় তাহার খেলাঘরটি, কোথায় খোলা মাঠ!
বাবলাশাখায় বাতাস যেথায় করতো ছড়া পাঠ।
বন্ধগলির অন্ধ কোণের কয়েদখানার ঘরে,
কোন্ দোষের সে বন্ধ হয় কোন্ অপরাদ করে?

কোন দস্যু করল হরণ আলো- বাতাস তার,
কে হরিল খেলার পুতুল নাচের নূপুর পার
কে হরিল ঝুমঝুমি তার শিশুহাতের থেকে,
ঊষার গায়ে কে দিলরে মেঘের কালি মেখে?

কোথায় আমার রাজার কুমার! শুয়ে মায়ের কোলে,
তোমার কি ঘুম ভাঙবে না এই শিশু-চোখের জলে।
শান্ত্রী সিপাই লয়ে এসো সপ্তা-ডিঙা করে,
আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠুক জয়ডঙ্কার স্বরে।
ভাঙতে হবে বন্ধগলি, রুদ্ধ ঘরের দ্বার-
ভাঙতে হবে লক্ষযুগের অন্ধ কারাগার।

এমন নগর গড়বে তুমি সকল কোণেই তার,
সমান হয়ে উদাস বাতাস বইবে অনিবার।

চন্দ্র-রবির সোনার প্রদীপ জ্বলবে সবার ঘরে,
সকল ঘরের পূর্ণিমাদের হাসিমুখের তরে।
সেই আলো কেউ বন্ধ করে রাখতে যদি চায়,
তাহার সাথে যুদ্ধ মোদের সকল দুনিয়ায়!

মা ও খোকন

মা বলিছে, খোকন আমার! যাদু আমার মানিক আমার!
উদয়তারা খোকন আমার! ঝিলিক মিলিক সাগর-ফেনার!
ফিনকি হাসি ক্ষণিকজ্বলা বিজলী-মালার খোকন আমার!
খোকন আমার দুলকি হাসি, ফুলকি হাসি জোছনা ধারার।
তোমায় আমি দোলার উপর দুলিয়ে দিয়ে যাই যে দুলে, –
যাই যে দুলে, সকল ভুলে, রাঙা মেঘের পালটি তুলে,
দেই তোমারে দোলায় দুলে।
খোকন তখন লাফিয়ে উঠে
সাইকেলেতে যায় যে ছুটে,
বল খেলিয়ে খেলার মাঠে সবার তারিফ লয় যে লুটে।

মা বলিছে, খোকন আমার! মানিক আমার!
এতটুকুন দস্যি আমার! লক্ষ্মী আমার!
হলদে রঙের পক্ষী আমার!
তোমায় আমি পোষ মানাব বুকের খাঁচায় ভরে
তোমায় আমি মিষ্টি দেব, তোমায় আমি লজেন্স দেব,
তোমায় আমি দুধ খাওয়াব সোনার ঝিনুক ভরে!
খোকন তখন লাফিয়ে উঠে, রান্না ঘরে যায় যে ছুটে,
কলাই ভাজা চিবোয় সে যে পূর্ন দুটি মুঠো।

মা বলিছে, খোকন আমার! যাদু আমার! মানিক আমার!
ঈদের চাঁদের হাসি আমার! কেমন করে রাখি তোরে
বুকের মাঝে ধরে?
এতটুকুন আদর আমার! দূর্বা শিষের শিশির আমার!
মেঘের বুকের বিজলী আমার!
সকল সময় পরাণ যে মোর হারাই হারাই করে;
এত করে আদর করি ভরসা না পাই
তোরে আমার বুকের মাঝে ধরে।
পাল-পাড়াতে কলেরাতে, মরছে লোকে দিনে রাতে,
বোস পাড়াতে বসন্ত আজ দিচ্ছে বড়ই হানা,
আমরা মাথার দিব্যি লাগে ঘরটি ছেড়ে-
যাসনে কোথাও ভুলি মায়ের মানা।

খোকন তখন লাফিয়ে উঠে, ওষুধ লয়ে যায় যে ছুটে,
পাল-পাড়াতে দিনে রাতে রোগীর সেবা করে;
মরণ-মুখো রোগী তখন অবাক হয়ে চেয়ে দেখে
ফেরেস্তা কে বসে আছে তার শিয়রের পরে।
মুখের পানে চাইলে, তাহার রোগের জ্বালা।
যায় যে দূরে সরে।

মা বলিছে, খোকন আমার! সোনা আমার!
হীরে-মতির টুকরো আমার! টিয়ে পাখির বাচ্চা আমার!
তোরে লয়ে মন যে আমার এমন ওমন কেমন যেন করে।
পুতুল খেলার পুতুল আমার! বকুল ফুলের মালা আমার!
তোরে আদর করে আমার পরাণ নাহি ভরে।
ও পাড়াতে ওই যে ওধার, ঘরে আগুন লাগছে কাহার,
আজকে ঘরের হোসনেরে বার,
আমার মাথায় হাত দিয়ে আজ বল ত শপথ করে।

খোকন তখন লাফিয়ে উঠে, ক্ষিপ্ত হয়ে যায় যে ছুটে,
জ্বলন্ত সেই আগুন পানে সবার সাথে জুটে।
দাউ দাউ দাউ আগুন ছোটে, কুন্ডলী যে পাকিয়ে ওঠে;
ওই যে কুঁড়ে, ঘরের তলে, শিশু মুখের কাঁদন ঝলে,
চীৎকারিয়ে উঠছে মাতা আঁকড়িয়ে তায় ধরে।
জ্বলছে আগুন মাথার পরে কে তাহাদের রক্ষা করে।
মুহূর্তে যে সকল কাঁদন যাবে নীরব হয়ে;
সেই লেলিহা আগুন পরে খোকা মোদের লাফিয়ে পড়ে,
একটু পরে বাইরে আসে তাদের বুকে করে।

মা যে তখন খোকারে তার বুকের মাঝে ধরে,
বলে আমার সোনা মানিক! লক্ষ্মী মানিক!

ঘুমো দেখি আমার বুকের ঘরে।
খোকা বলে, মাগো আমার সোনা মানিক।
সকল শ্রানি- জুড়াব আজ তোমার কোলের পরে।